বার্ষিক ১০ শতাংশ সুদে বর্গাচাষীদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার ঋণ
— একটি প্রয়োগ-পূর্ব পর্যালোচনা

সাজ্জাদ জহির
পরিচালক, ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ
৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা

বাংলাদেশের কৃষিকে সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে কার্যকরী সকল উদ্যোগকে স্বাগত জানানো প্রয়োজন। বিশেষত, খাদ্যে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের লক্ষে শষ্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরী। বর্তমান বাস্তবতায় অনেকে মনে করেন যে, বাজারের দামের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি-কৃষক যে নিবিড়তার সাথে চাষ করবেন ও যে পরিমাণ উৎপাদন করবেন, সামাজিক লাভ-ক্ষতির বিচারে তার চাইতে বেশী উৎপাদনে তাকে উৎসাহী করা প্রয়োজন। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে, সহজ-সুদে বর্গাচাষীদের ঋণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগকে কাঙ্খিত মনে হয়। তবে, শুরুতেই এর কয়েকটি দিক বিবেচনায় আনা প্রয়োজন — অন্যথায়, যে উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা ব্যর্থ হতে পারে। যেহেতু একই লক্ষ অর্জনের জন্য একাধিক পন্থা থাকতে পারে; ঋণ-বাজারের মাধ্যমে 'বর্গাচাষী'দের আর্থিক প্রণোদন দেয়াটাই উত্তম কিনা, তা নিয়ত নিরীক্ষণাধীন রাখাও প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ্ করছি।

- ২০০৯-১০ সনে সরকার ঘোষিত কৃষি খাতে প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ ১১,৫০০ কোটি টাকা। বর্গা চাষীদের জন্য যে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা উক্ত বরাদ্দের ৫% এর কিছুটা কম।
- পুনঃঅর্থায়নের ভিত্তিতে ব্রাক-এর মাধ্যমে এই ৫০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ হবে।
- সারা দেশে নয়, কেবলমাত্র ৩৫ টি জেলার ১৫০ টি উপজেলায় এই ঋণ বিতরণ হবে।
- একে ক্ষুদ্রঋণ বলা হচ্ছে না, বরং এই শষ্যঋণকে আভাসে-ইঙ্গিতে 'ব্যাংক-ঋণ' বলা হচ্ছে।
- ব্রাক বার্ষিক ভিত্তিতে ৫% সুদ বাংলাদেশ ব্যাংককে দিবে। যদিও ১০% হারে বর্গাচাষীকে ঋণ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং একে 'শষ্যঋণ' আখ্যায়িত করা হয়েছে, তথাপি পত্রিকা মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ফসল উঠার আগে আদায়যোগ্য ঋণের ৩০% মাসিক কিস্তীতে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকী ৭০% ফসল উঠার পর সমান দুটো মাসিক কিস্তীতে পরিশোধ করতে হবে।
- বর্গাচাষী'র কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি, তবে ১৪ই জুলাই ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লীঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী (সার্কুলার নং-৪)-এ উল্লেখ রয়েছে যে, "ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমান ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) তথা বর্গাচাষীদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে"। উক্ত নীতিমালায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, বর্গাচাষী একজন 'প্রকৃত কৃষক' যিনি অন্যের জমি বর্গায় নিয়ে চাষ করেন, এবং তা যাচাইয়ের দুটো সম্ভাব্য পথ হলোঃ জমির মালিকের দেয় একটি প্রত্যয়নপত্র, অথবা স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যাক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্র।
- একই নীতিমালায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/আত্ম-সহায়ক গ্রুপ-এর সাথে অন্বয় স্থাপন করে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। অতি সম্প্রতি, ২৬শে আগষ্টের এসিএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৬ ঋণ পাবার যোগ্য কর্মকান্ডে 'টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন'কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- যে সকল (বর্গাচাষী) পরিবারের প্রধান এস,এস,সি পাশ নন, তাদেরকে ঋণ-প্রাপ্তিতে প্রাধাণ্য দেয়া হবে, এই মর্মে পত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশের বর্গাচাষীঃ ভারত-অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাংলায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি পর্যায়ে ‘বর্গাচাষী’ যেভাবে স্বীকৃত, বাংলাদেশে তেমনটি ঘটেনি। নীল-চাষী ও আঁধিয়ার-দের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে যেমন বর্গাচাষী’র ব্যানারে কোনও সমাজগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয়নি, একইভাবে, জোত বিভাজনের প্রক্রিয়া ও কৃষিতে প্রতিবন্ধী-রূপ (retarded) বাণিজ্যিকরণের ফলে সমস্বার্থের অধিকারী ‘বর্গাচাষী’ নামক একক কোনও সামাজিক বা অর্থনীতিক শ্রেণী এ দেশে দানা বাঁধতে পারেনি। তবে পরিসংখ্যানে এর উপস্থিতি যত্রতত্র। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো’র ২০০৮ সনের কৃষি শুমারী’র প্রাক-রিপোর্ট সংক্ষিপ্তসার অনুযায়ী গ্রামীন সকল খানার/পরিবারের মাত্র ৫৬.৭৪% কৃষি খামার এবং বর্গাচাষীর সংখ্যা সর্বমোট কৃষিখামারের ৫৫%। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সনের কৃষি জরীপে সর্বমোট কৃষিখামারের মাত্র ৪০% আংশিক (উভয় স্ব-মালিক চাষী এবং বর্গাচাষী) বা পরিপূর্ণ বর্গাচাষী ছিল। নিখাদ বর্গাচাষী মোট খামার পরিবারের মাত্র ৩.২ শতাংশ এবং (২০০৫ সনের জরীপ অনুযায়ী) তারা মোট আবাদী জমির ২.৪ শতাংশ চাষ করে।

২০০৯ সনে ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ই,আর,জি) পরিচালিত দেশ-ব্যাপী এক জরীপে দেখা যায় যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জরীপকৃত (৭৪ টি) গ্রামে বর্গাচাষ প্রথার প্রাধাণ্য রয়েছে। তবে, এদের কেবল এক-তৃতীয়াংশে সারা বছর ব্যাপী সকল মৌসুমী ফসলের ক্ষেত্রে এ প্রথা চালু আছে; প্রায় ৪২ শতাংশ গ্রামে শুধু ইরি/বোরো ধানের সময় তা চালু আছে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ, কেবল ভাগচাষে নয়, অর্ধেকেরও বেশী ক্ষেত্রে নগদ খাজনায় জমি বর্গা নেয়া হয়। ই,আর,জি-র উক্ত জরীপের ফলাফল থেকে আরো জানা যায়, যে সকল এলাকায় বানিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি কর্মকান্ড পরিচালিত হয়, সেসব এলাকায় ভাগচাষে জমি বর্গায় নেয়ার প্রথা বিলুপ্ত-প্রায়, এবং নগদ খাজনার ভিত্তিতে জমির ব্যবহার-স্বত্বের লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত এলাকায় অনেক সময় তাই বন্দকী ব্যবস্থা থেকে নগদ খাজনার পার্থক্য টানা দুরূহ। বাংলাদেশের চিংড়ী চাষাধীন দক্ষিনাঞ্চল ও আলু চাষাধীন এলাকায় (যেমন, মুন্সীগঞ্জ)এমন নগদ-ভিত্তিক লেন-দেনের মাত্রার অধিক্য দেখা যায়।

কি উদ্দেশ্যে? লক্ষ ও টার্গেটঃ মনে হতে পারে যে ঋণ-কর্মসূচীর উদ্দেশ্য পল্লী এলাকার দরিদ্র বর্গাচাষীদের সহায়তা করা। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর বর্ণিত উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থানমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ। সঙ্গতঃকারণেই প্রশ্ন জাগে, বর্গাচাষীদের হাতে ঋণ পৌছে দিতে পারলেও এরফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে কিনা। এর উত্তর যথার্থভাবে পেতে হলে জানা প্রয়োজন, স্বল্পসুদের বাড়তি সুবিধা কে পাবে?

অতীতের মাঠ-গবেষণা থেকে আমরা জানি যে পল্লী অর্থনীতিতে ঋণ-প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে জমি বর্গার ধরণ ও শর্তাবলীতে তার প্রভাব পড়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জমির মালিক ও বর্গা চাষীর মধ্যকার বন্টন শুধুমাত্র ফসলের অংশ বা খাজনার পরিমান নির্ধারনেই সীমিত নয়; বীজ, সার ও সেচ বাবদ খরচ অনেক ক্ষেত্রে বর্গাচাষী ও জমির মালিকের মাঝে ভাগাভাগী হয়, এবং সেসবের শর্তাবলীতে পরিবর্তন ঘটতে পারে। সহজ সুদে ঋণ-প্রাপ্তি যদি জমির কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি ঘটায়, বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে সেই লাভের কিছুটা জমির মালিকেরাও পান। যদি বর্গাচাষীদের জমি পাবার (বর্গায় নেয়ার) চাহিদা অফুরন্ত হয়, প্রণোদনের পুরোটাই বাড়তি খাজনা হিসেবে জমির মালিকের প্রাপ্তিতে পরিনত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বললে, যদি ঋণ বাজারে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্গাচাষীরা পর্যাপ্ত উপকরণ ব্যবহারে ব্যর্থ হয় এবং তার ফলে সর্বোত্তম উৎপাদন যদি ব্যহত হয়, সুলভে ঋণপ্রাপ্তি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ঋন-বাজারের সাথে জড়িত উন্নয়ন-কর্মীরা এই প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং সেই আলোকে পি,কে,এস,এফ-এর মত সংস্থাও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য পৃথক ঋণ-কর্মসূচীর কথা বলে। তবে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জমির মালিক তাতে ভাগ বসাবে, এবং সে কারণেই লাভ বন্টনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা

হয়েছে। একই যুক্তিতে নব-প্রবর্তিত ঋণ-কর্মসূচীতে কেবলমাত্র বর্গাচাষীদের বেছে নেয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়। ঋণের চাহিদা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 'মালিক চাষী'দেরও রয়েছে (যারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করেন)। এবং অনেকেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে মনে করেন যে জমির মালিক যদি নিজেই চাষী হন, নির্দিষ্ট প্রণোদনে ভাগচাষীর চাইতে তার উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেশী। তাই, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝ থেকে কেবলমাত্র বর্গাচাষী'র জন্য বিশেষ ঋণ-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়ে যায়।

বর্তমানে প্রণীত কর্মসূচী কতখানি সুষম বন্টন-মুখী এবং কতখানি উৎপাদন-মুখী, তা সারণী-১ এর তথ্য দেখলে স্বচ্ছ হবে। বর্তমান কর্মসূচী নীচে বর্ণিত 'ক' ও 'গ' গোষ্ঠীকে টার্গেট করেছে। অথচ, সুষম-বন্টনের বিচারে কেউ কেউ 'ক' ও 'খ' গোষ্ঠী-কে টার্গেট করা আশু মনে করতে পারেন। উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চাইলে 'ট' ও 'ঠ'-কেও অন্তর্ভুক্ত করবার যুক্তি দেয়া সম্ভব। সার্বিক বিচারে দুটো লক্ষের ভারসম্য রাখতে চাইলে 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' — এই চারটি গোষ্ঠীকে টার্গেট করে ঋণ বিতরণের প্রয়োজন ছিল। নিঃসন্দেহে, অন্যের জমি বর্গায় নিয়ে চাষ করার উদ্যোগ গতিশীল উদ্যোক্তার পরিচায়ক; কিন্তু বাজার থেকে ক্রীত উপকরণের উপর নির্ভরশীল উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মালিক-চাষীদেরও সমমানের উদ্যোক্তা গন্য করা প্রয়োজন।

সারণী-১
জমি মালিকানা ও চাষ-পদ্ধতির ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন

	বর্গাচাষী — নিখাদ বা মিশ্র	বর্গায় জমি নেয় না, তবে নিজের জমি চাষ করে	নিজে চাষ করে না
গরীব চাষী - ০.৪৯ একরের কম, যার উল্লেখ নেই	প	ফ	ব
প্রান্তিক চাষী - ০.৪৯ একরের অধিক অথচ স্বল্প জমির মালিক	ক	খ	চ
ক্ষুদ্রচাষী — ২.৫ একরের কম	গ	ঘ	ছ
বৃহত চাষী — ২.৫ একরের অধিক	ট	ঠ	ড

নোটঃ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রের সংজ্ঞায় 'গরীব চাষী' বাদ পড়েছে। অনেকে অনুমান করেন যে চলমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী এদের অন্তর্ভুক্ত রেখেছে।

আসলেই কি অন্যদের সাথে বর্গাচাষীর পার্থক্য রয়েছে? বাস্তবে বর্গাচাষী চিহ্নিত করা এক দূরূহ কাজ। বর্গা-কেন্দ্রিক চুক্তি নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই এবং এর বাস্তব-সম্মত কারণও রয়েছে। এমতাবস্থায়, কে ঋণ পাবার যোগ্য তা কাগজে-কলমে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এবং "স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যাক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্র" গ্রহনের সুযোগ অযাচিত রাজনৈতিক প্রভাবের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, যা পরে আবারো আলোচনায় আনবো। তবে আগের আলোচনার সূত্রধরে যাচাই করা প্রয়োজন যে বর্গাচাষীরা আদতেই সহজে চিহ্নিত হবার মত কোনও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী কিনা।

ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ-এর ২০০৯ সনের একটি গবেষণার আওতায় চার বিভাগের দশটি গ্রামে সকল খানার শুমারী থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য ২ নং সারণীতে দেয়া হয়েছে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে বন্দকীতে নেয়া জমি নগদ খাজনায় বর্গায় নেয়ার সামিল, তথ্যাদি দুটো বিভাজনের ভিত্তিতে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, যারা বর্গায় নেন, তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ (যারা নেন না তাদের তুলনায়) কম। কিন্তু লক্ষণীয় যে তাদের ভিটেজমির পরিমাণ কিছুটা বেশী! আরও লক্ষনীয় যে বর্গাচাষীদের শতকরা ৫০ জন সারা বছর অথবা বছরের অধিকাংশ সময় তিনবেলা খেতে পারেনা। সেই তুলনায় যারা বর্গায় চাষ করেন না, তাদের ৪৭% পরিবারের খাদ্যাভাব রয়েছে, যদিও এটা এমন কোনও পার্থক্য নয়। ২ নং সারণী থেকে

আরো জানা যায় যে, উভয় (বর্গাচাষী ও যারা বর্গাচাষী নন) গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ নেয়ার মাত্রা একই – প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরিবার বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার কাছে দেনাগ্রস্ত।

সারণী-২
বর্গা চাষীদের সাথে অন্যদের পার্থক্য

বর্ণণা	বর্গায় জমি নেয়	বর্গায় জমি নেয় না	বর্গায় বা বন্দকীতে নেয়	বর্গায় বা বন্দকীতে নেয় না
১০ টি গ্রামের শুমারী (মোট খানার শতকরা অংশ)	২৪.১০	৭৫.৯০	৪২.০	৫৭.৩০
গড় মোট জমির মালিকানা (শতক)	৪২.১৫	৫৯.০০	৪৮.৭৯	৫৯.৫৩
গড় আবাদী জমির মালিকানা (শতক)	২৭.২০	৪৪.৪০	৩৪.৩৮	৪৪.৬৩
গড় ভিটে জমির মালিকানা (শতক)	৮.২০	৬.৮৯	৭.৯১	৬.৬৭
খানা প্রধান স্বাক্ষর দিতে বা পড়তে পারেন না[১]	২৮.৫০	২৬.৪০	২৮.০০	২৬.০০
খানা প্রধান মাধ্যমিক (এস,এস,সি) পাশ	৪.০০	৫.৫০	৪.৭০	৫.৫০
স্ব-ঘোষিত দারিদ্র্য অবস্থা – খাদ্যাভাব ভিত্তিক[২]	৫০.৪০	৪৭.৩০	৩৯.০০	৫৪.৮০
ক্ষুদ্রঋণ দেনা আছে (মোট খানার শতকরা অংশ)	৭৫.৬০	৭৪.৪০	৭৩.৪০	৭৫.৭০

নোটঃ ১। এদের কোনও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাও নেই। তবে, যারা স্কুলে যায়নি অথচ স্বাক্ষর দিতে বা পড়তে পারেন, তাদেরকে এই হিসেবে ধরা হয়নি।
২। যে সকল পরিবারের সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় তিন বেলা খেতে পারার ক্ষমতা নেই, তাদের গণ্য করা হয়েছে।
উৎসঃ ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপের ২০০৯ সমীক্ষা।

পত্রিকা মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে খানাপ্রধান ম্যাট্রিক পাশ না হলেই কেবল ঋণ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। সাধারণতঃ, এজাতীয় বিকল্প নির্দেশক/তথ্য আমরা কাঙ্খিত টার্গেট পরিবার বাছাই নিশ্চিত করতে ব্যবহার করি। কিন্তু বর্গাচাষীদের মাঝে এস,এস,সি পাশের হার যেখানে ৪%, অন্য গোষ্ঠীর (বর্গা নেন না) ক্ষেত্রে তা ৫.৫%; এবং এ'দুটোর ব্যবধান উল্লেখজনক নয়। তাই, এস,এস,সি পাশ জাতীয় তথ্যের ভিত্তিতে যোগ্য ঋণ-গ্রহীতা বাছাই নির্ভরযোগ্য হতে পারেনা। উপরন্তু, এজাতীয় মাপকাঠি শিক্ষার প্রসারের বিরুদ্ধে যায় – এস,এস,সি পাশ করে যেন এক বর্গাচাষী পাপ করে বসেছে এবং তাই তাকে ঋণ দেয়া হবে না?! বরং, উৎপাদন বৃদ্ধি যদি লক্ষ হয়, এটা ভাবা অবান্তর নয় যে, একজন শিক্ষিত কৃষক (যদি তিনি চাষের সাথেই জড়িত হন) অনেক বেশী দক্ষতার সাথে ঋণ-এর ব্যবহার করবেন।

আসলেই কি সুলভ সুদে ঋণ দেয়া হবে? বিগত কয়েক বছর ক্ষুদ্রঋণে সুদের হার নিয়ে অহেতুক অনেক বিতর্ক হয়েছে। সুস্থ-মস্তিষ্কের যে কোনও ব্যাক্তি আজ স্বীকার করবেন, শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রিক ব্যাংক ঋণ যে সুদে বিতরণ সম্ভব, তার থেকে অধিক-হারে ক্ষুদ্রঋণের সুদ ধার্য করা আবশ্যিক। তবে উল্লেখ্য, সুদের হার প্রকাশে অনেক অস্বচ্ছতা রয়েছে, যা দূর করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন। তাই বর্গাচাষীদের দেয় ঋণের উপর কি হারে সুদ আরোপ করা হচ্ছে, তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অনুমান করা যেতে পারে যে, ঋণ দেয়ার একমাস পর প্রথম কিস্তী নেয়া হবে এবং ফসল উঠার আগে এমনি তিনটি মাসিক কিস্তীর মাধ্যমে মোট দেয়'র ৩০% পরিশোধ করা হবে। যেহেতু বাকী ৭০% সমান দুটো মাসিক কিস্তীতে ফসল উঠার পর পরিশোধ করা হবে, আরো অনুমান করা যাক যে চতুর্থ ও পঞ্চম মাসের শেষে কিস্তী-প্রতি মোট দেয়'র ৩৫% পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ, একজন ঋণ-গ্রহীতা পাঁচ মাসের মধ্যে সকল ঋণ পরিশোধ করবেন। এই বাস্তবতায় দেয় সুদের চিত্রটি ভিন্ন। যদি ফ্লাট রেট-এ সুদ ধার্য করা হয়, অধিকাংশ সংস্থার প্রবণতা প্রতি ১০০০ টাকা আসলে ১০০ টাকা সুদ হিসেব করা – যদিও বাৎসরিক ১০% হলে ৫ মাসের জন্য তা ৪২ টাকা হওয়া উচিত (৬ মাসের ক্ষেত্রে বড়জোর ৫০ টাকা)। অংকের খেল আরো অদ্ভুত। যদি প্রথম তিন মাসের প্রতি কিস্তী ১১০ টাকা করে, এবং শেষ দু'মাসের প্রতি কিস্তী ৩৮৫

টাকা করে মোট ১১০০ টাকা পরিশোধ করে, কার্যকরী বাৎসরিক সুদের হার ৩১% হয়। যদি মোট সুদ ৫০ টাকা ধার্য করে ১০৫ টাকার তিনটি কিস্তী ও ৩৬৭ টাকা ৫০ পয়সার দুটো কিস্তীতে পরিশোধ হয়, বাৎসরিক সুদের হার হবে প্রায় ১৬% । এখনও পরিষ্কার নয়, কোন পথ ব্রাক নিবে।

কেন ব্রাক? প্রকাশিত বক্তব্য অনুযায়ী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বর্গাচাষীদের কাছে ঋণ পৌছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন এমন একটি সংগঠন যার দেশ-ব্যাপী নেট-ওয়ার্ক রয়েছে। নিঃসন্দেহে, অন্য পাঁচটি সংগঠনের তুলনায় ব্রাক-এর কিছু বাড়তি যোগ্যতা রয়েছে — এটি ত্রিশ বছরের অধিককাল সেবা-ধর্মী কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে; এবং একই সাথে এদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী রয়েছে। তদুপরি, ব্রাক-এর বৃহদাকারে ঋণ দেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং ব্রাক ব্যাংকের সাথে মিলে আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে এরা জড়িত রয়েছে। তবে ব্রাক-এর নতুন ঋণ-কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্টতার বড় সনদ সম্ভবত কৃষি সম্প্রসারণের এর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। ব্রাক বানিজ্যিক ভিত্তিতে হাইব্রীড বীজ বিপণন করে এবং আন্তর্জাতিক বীজ কোম্পানীর সহায়তায় দেশে-বিদেশে কৃষকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন ফসল চাষে উন্নতমানের বীজ ব্যবহার সম্প্রসারণ করছে। এবং এই কাজে অনেক সময় ঋণ-কর্মসূচীকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

পুণঃভাবনাঃ আলোচনায় তিনটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে — ঋণ-বাজার, জমির ব্যবহার-স্বত্বের লেনদেনের বাজার যেখানে বর্গাচাষীরা একটি পক্ষ, এবং কৃষি-সম্প্রসারণ যা এক বা একাধিক উৎপাদন-পদ্ধতি প্রসারের সাথে সম্পৃক্ত। এই তিনটি দিককে বিবেচনায় এনে নব-প্রবর্তিত কর্মসূচীর পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিত থেকে কিছু প্রাথমিক ভাবনা নিম্নে আলোচনার জন্য তুলছি।

অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ঋণ-বাজারের দিকে তাকালে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

অস্বীকার করবার নয় যে ব্রাক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সাথে এখনও জড়িত। সাধারণভাবে, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ তহবিল জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে এবং বিগত বছরগুলোতে 'দান'এর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তাদের তহবিল সংগ্রহের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসাথে স্থানীয় পর্যায়ে সঞ্চয় সংগ্রহ আইনানুগ না করায় এসব সংস্থা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চসুদে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায়, ৫% হারে ব্রাক-এর তহবিল প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে তাদেরকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিবে। এই তহবিল তৈরীর ফলে তাদের (বর্গাচাষী) সদস্যেরা অধিকতর ঋণ পাবার বা ঋণ রিসিডিউল করবার সুযোগ পাবে, যা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোকে সংকটে ফেলতে পারে। আরোপিত কার্যকরী সুদের হার ২০ থেকে ২৪%, যা আধিকাংশ ক্ষুদ্রঋনের সুদের হারের থেকে কিছুটা কম, তবে প্রতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার থেকে বেশী। এসব কারণে নতুন ঋণ ক্ষুদ্রঋণের সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তবে ঋণের গড় পরিমান ও কিস্তীসংখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণ (সাপ্তাহিক কিস্তী-ভিত্তিক) ঋণের সাথে শষ্যঋণের তফাত রয়েছে, এবং এদুটোর আপেক্ষিক ভাল-মন্দ বিচারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য নিরীক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। শেষোক্ত যুক্তিতে অবশ্য বলা যায় যে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য পি,কে,এস,এফ-পরিচালিত ঋণ-কর্মসূচী প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হবে। পরিশেষে উল্লেখ্য, যদি অর্থের বিনিময়ে ব্রাক ব্যাংকের কাছ থেকে গ্যারান্টি নেয়া হয় যা লভ্যাংশ থেকে সমন্বয় করা হবে, সমগ্র বিনিময় প্রক্রিয়ায় বর্তমান সংকটকালে ব্রাক-পরিবার কিছুটা স্বস্তি পাবে!

বাড়তি ঋণ-প্রাপ্তি বর্গার শর্তাবলীর উপর কি ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে তা আগেই উল্লেখ করেছি। আরো উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণের বড় অংশ বহুদিন যাবত বর্গা বাজারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা সত্য যে শষ্যঋণের ন্যায় কিস্তী থাকায় অনেকে আকৃষ্ট হবেন, তবে কেবলমাত্র সুদের হারের কারণে বর্গাচাষীদের বিরাট কোনও লাভ হবার সম্ভাবনা কম। কারণ, সামান্য বেশী সুদে বিকল্প উৎস থেকে ঋণ পাবার সুযোগ তাদের রয়েছে। অর্থাৎ নতুন কর্মসূচীতে কেবল সহজ সুদে বর্গাচাষীদের ঋণ দিয়ে কৃষি উৎপাদনে বড় কোন পরিবর্তন আনা

সম্ভব হবে না — এমনকি সুষম বন্টন অর্জনে তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই তুলনায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র সকল চাষীর কাছে ঋণ পৌছে দেয়া অধিকতর মঙ্গল আনার সম্ভাবনা রাখে।

উপরোক্ত দুটো বিষয়ে বর্গাচাষীর জন্য ব্রাক-এর মাধ্যমে ঋণ-কর্মসূচীর এমন কোন যৌক্তিকতা না পেলেও তৃতীয় কারণে এর ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ-কে বাদ দিলে, বাংলাদেশের (সম্ভবত) সকল বিশেষ ঋণ-কর্মসূচী কোন না কোন প্রযুক্তি বিপণন প্রসারে সম্পূরক ভূমিকা রেখেছে। আশির দশকে টিউবওয়েল বসিয়ে সেচের দ্বারা উফশী ধানের আবাদ প্রসার থেকে শুরু করে বর্তমানে সৌর-প্যানেল বিপণনে বিশেষ ঋন-কর্মসূচীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে প্রথম দিকের এজাতীয় প্রয়াসে ঋণ-কর্মসূচী পৃথকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হতো এবং মাঠ-পর্যায়ের সম্প্রসারণ/সেবা-ধর্মী উন্নয়ন কর্মকান্ড ভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হতো। নব্বুইয়ের দশকে এই পদ্ধতিতে চালিত বিভিন্ন প্রকল্প ব্যর্থ হয় (এ ব্যাপারে আই,এফ,আ,ডি-এর ২০০৫ সন অবধি প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ণ দ্রষ্টব্য)। বিশেষত, পুণঃঅর্থায়নের বিশাল অংকের তহবিল বিবিধ উপায়ে তছরুপ হয়, এবং প্রকল্প প্রণয়নে দূর্বলতা থাকায় এজন্য কোনও সংস্থাকেই দায়বদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। এরও পর, ক্ষুদ্রঋণের আওতায়, পণ্য বিপণন অথবা সেবা সরবরাহের সাথে ঋণকে বেঁধে দেয়ার নানাবিধ পরীক্ষা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ঋণ বিতরণের দ্বারা এক বা একাধিক কৃষি প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষে ব্রাক-কে বেছে নিলে অবাক হবার কিছু নেই। অথবা এমনও হতে পারে, হত-দরিদ্রদের বর্গাচাষে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকা উন্নত করার ব্রাক-প্রয়াস সফল করাই এই ঋণ-কর্মসূচীর উদ্দেশ্য? কেবল ঋণ-কর্মসূচীর ভিত্তিতে ব্রাক-কে বেছে নেয়ার যথার্থ যুক্তি পাওয়া যায় না।

মতামতঃ সরকারী প্রণোদন-পুষ্ট কোন কর্মসূচীর তাৎপর্য ন্যুনতম দুটো ক্ষেত্রে রয়েছে। প্রথম, যেসকল অর্থনীতিক খাতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে, ঋণ, জমি বর্গা ও কৃষি সম্প্রসারণ-ধর্মী সেবা বাজার বা খাত দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়, প্রতিষ্ঠানিক খাত — যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচী প্রয়োগ করা হচ্ছে (সেটা সরকারী হোক বা বেসরকারী হোক) সেই প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছু সুবিধা পায় যা নির্দিষ্ট অর্থনীতিক খাতসমূহের ভবিষ্যত রুপরেখাকে প্রভাবান্বিত করে। এই দ্বিবিধ তাৎপর্য অনুধাবন করে ব্রাক-এর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবাসমূহ আরো স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে আমি মনে করি, আশু ভিত্তিতে কিছু কৃষি প্রযুক্তি চিহ্নিত করে তার প্রসারে সম্পূরক ভূমিকায় এই ঋণকে দেখা প্রয়োজন। সম্ভব হলে, এই কর্মসূচীর আওতায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র 'মালিক চাষী'দেরও অন্তর্ভুক্ত করা। এরফলে, বর্গাচাষী বাছাইয়ে অর্থ ও সময় অপচয় না করে নির্দিষ্ট প্রযুক্তির প্রসার অবলোকনের মাধ্যমে সফলতা নিশ্চিত করায় মনোনিবেশ করা যেতে পারে। আমি আরো আশা করবো যে সমগ্র প্রয়াস — ঋণ-গ্রহীতা ও বিনিয়োগ খাত নির্বাচন — যেন অনাকাংখিত ক্ষমতার প্রভাবে দুষ্ট না হয়। নিঃসন্দেহে সহজ-মূল্যে এই তহবিল প্রাপ্তি ব্রাক-কে বিভিন্নভাবে উপকৃত করবে। এর বিনিময়ে ব্রাক-এর কাছ থেকে পাওনাগুলো সুনিশ্চিত করা জরুরী।

[নিবন্ধটিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্ত নিজস্ব। এ লেখাটির উপর মত/মন্তব্য দিতে চাইলে sajjad@ergonline.org ঠিকানায় ই-মেইল করুন।]